মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার

প্রথম পাতার পর

সরকার বা পার্টির ধারেকাছে যাঁরা আছেন তাঁরা এতদিন বিভাসকে/বিভাসদাকে সাময়িকভাবে বিগড়ে যাওয়া একজন প্রগতিশীল বামপন্থী মানুষ বলে চালিয়ে দিয়ে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি এরকম করতে থাকলে তো তাঁদের আর কিছুই করার থাকে না। আমার কাছে এর শুধু একটা উত্তরই আছে— বেশ করেছি ভাই, কবীর সুমনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। ২০০৭-এর ১৪ মার্চ তারিখে (বিকেল তিনটেয়) এই হঠকারী লোকটিই এই রাজ্যের প্রথম ব্যক্তি যে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করেছিল। তখন যদি কারও অনুমতি বা মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে না করে থাকে লোকটা, এখনই বা নিতে যাবে কেন?

আমার জন্য বন্ধুদের হয়তো বাম-মহলে মুখ দেখাতে লজ্জা করছে। আমার তো শতগুণ বেশি লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যখন দেখি আমার সেইসব বন্ধুরা রাজনৈতিক নেতাদের উপদেশামৃত শোনার জন্য বোকা বোকা মুখ করে সভা আলো করে বসে আছেন। বলতে চাইছেন, স্যার, আমার মুখটা দেখেছেন তো? মনে রাখবেন, আমি কিন্তু এসেছিলাম স্যার। ও সঞ্জুদা, আমার নামটা কিন্তু লিস্টে লিখে রাখবেন। দাদারা কেউ প্রশ্ন করলে যেন বলতে ভুলবেন না যে আমি হাজির ছিলাম। লজ্জা হয় কেন জানেন? আপনারা সবাই জ্ঞানপাপী। আপনারা জানেন যে, ওরা জোর করে গরিব কৃষকদের জমি দখল করেছে। অবশ্য ওরা বলছে, আমার আপনার মতো শহুরে বাবুদের ঘরের গোটা কয়েক ছেলেমেয়ের নাকি চাকরি হবে তাতে। আপনারা জানেন, ওরা গরিব মানুষদের খুন করেছে, মহিলাদের ধর্ষণ করেছে। তেমন আকাট মুখ্যুও আপনারা নন যে ইতিহাস জানেন না— মরিচঝাঁপি, ছোট আঙারিয়া, বিজনসেতু, তাপসী মালিক, তসলিমা-বিতাড়ন, রিজওয়ান কাণ্ড— সবই তো আপনাদের জানা। ওই পার্টির মধ্যে কারা কারা ক্রিমিনাল, কারা মাফিয়া, কারা তোলাবাজ, কারা বন্দুকবাজ, কারা ধর্ষক, কারা খিস্তিবাজ, কারা ফেরেব্বাজ দালাল, কারা প্রোমোটার— কোনও কিছুই আপনাদের অজানা নয়। ওরা যে আমলা এবং পুলিশকেও কমরেড করে নিয়েছে তাও আপনাদের কাছে পরিষ্কার। তবুও আপনারা দু'কান কাটার মতো ওদের সঙ্গে থাকবেন? কেউ কবিতা পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে, কেউ বা সিনেমায় পার্ট করে ওদের শেখানো বুলি আউড়ে, কেউ সিডিতে পলিটিকাল পর্নো তৈরি করে, কেউ নাটক করে, তারস্বরে বলবেন, সব ঝুট হ্যায়, ওসব কিছুই হয়নি, হতে পারে না? ক্ষীর খাওয়ার সুদিনে বামপন্থী সেজেছে যে শিকারি বুড়ো ভাম, লালা ঝরিয়ে ঝরিয়ে ভোল পাল্টে লাল বা দালাল হয়েছে যে বহুরূপী, সেও চোরের মা-সুলভ বড় গলায় বলছে, এই সরকারই তোমাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, আর আজ কিনা তারই বিরোধিতা করছ তোমরা! সেই সরকারি টপ্পা গায়ককে জানাই, এই সরকার আমাদের প্রতিষ্ঠা দেয়নি। আমরাই সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে। আমাদের যশ বা খ্যাতি যদি কিছু হয়ে থাকে, হয়েছে সবই কংগ্রেসি আমলে— বিরোধিতার মাধ্যমে, প্রতিবাদের মাধ্যমে। তুমি জানবে কী করে হে? তুমি তো তখন অন্য সরকার, অন্য পার্টির চরণামৃত পান করে, রসেবশে স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছিলে। আজ উন্নততর হতে চাইছ! শোনো হে চাটুকার, এই সরকারের দেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু তা সরকারকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। যা দেওয়ার তা আমরাই দিয়ে ধন্য করেছি ওদের। 'দে গরুর গা ধুয়ে'-র মতো 'দে বেশ পাল্টে দে' হাঁক পেড়ে ঘন ঘন বেশ পালটাবার ওস্তাদি খেলায় অভ্যস্ত যে সাহিত্যিক, যাঁর 'পাল্টি খাওয়ার বৃত্তান্ত' নামক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার মুখে, আজকাল সেই দুর্ভাগ্য বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো। বরং আরেক কিসসা বলা যাক: সেই শম্ভু মিত্র-উৎপল দত্তর আমল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান দিয়ে আসছে নাট্যদলগুলিকে। আগে কয়েকটি মাত্র দল পেত, এখন তো কলকাতা-মফস্‌সলের বহু দলই পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দু-তিন বছর বাদ বাদ পাঁচ-দশ হাজারি গ্রান্ট নয়, গ্রুপগুলো দশ-বিশ লক্ষ করে টাকা পাচ্ছে, প্রতি বছর। কংগ্রেসি আমল থেকে জনতা আমল, বিজেপি আমল— কোনও আমলেই এই অনুদান বন্ধ হয়নি, দিন দিন বেড়েই চলেছে প্রাপক সংস্থার সংখ্যা, অনুদানের অঙ্ক। একবার কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের ওয়েবসাইটটা খুলে দেখলেই প্রমাণ মিলবে। তাছাড়া আছে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির অনুদান। রেল দফতর সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে এক-চতুর্থাংশ ভাড়ায় দেশের যে কোনও প্রান্তে গিয়ে অনুষ্ঠান করার সুবিধা দেয়। আয়করের ক্ষেত্রে পুরো ছাড় দেওয়া হয়। সরকার বৃত্তি দেয়, সিনিয়র জুনিয়র ফেলোশিপ দেয়, শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জাতীয় পুরস্কার দেয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করে। তা ভাই, কংগ্রেস, বিজেপি, জনতা দল কেউ তো কখনও বলেনি যে, আমাদের সরকারের কাছ থেকে এত কিছু পাচ্ছ, কোথায় আমাদের কেত্তন গাইবে, তা না, আমাদেরই বিরুদ্ধে নাটক করে বেড়াচ্ছ? বলেনি, কারণ কেউ কারও পিতার অর্থভাণ্ডার থেকে এই অনুদান-খয়রাতি করছে না, জনগণের টাকা থেকে শিল্প সংস্কৃতির উন্নয়নে বরাদ্দ আছে টাকা, তার থেকেই দিচ্ছে। দেওয়াটা জাতীয় কর্তব্য, দিতে বাধ্য, দিয়ে ধন্য হচ্ছে। আর আমরাও পাচ্ছি বলে উৎপল দত্ত থেকে শুরু করে ঊষা গাঙ্গুলি পর্যন্ত কেউই কেন্দ্রীয় সরকার বা ক্ষমতাসীন পার্টির গুণগান গেয়ে বেড়াচ্ছি না, বরঞ্চ উল্টোটা, অর্থাৎ তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি কখনও। এটাই শিল্পীর স্পর্ধা বা অহঙ্কারের পরিচয়।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে একবার এই রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের রাজভবনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য। শম্ভু মিত্র, শোভা সেন, রুদ্রপ্রসাদ থেকে আমি এবং অনেকেই উপস্থিত ছিলাম সেখানে। এটা পাচ্ছি না, ওটা পাচ্ছি না, সরকার কিছুই করছে না— প্রচুর অভিযোগ জানানো হল শ্রীমতী গান্ধিকে। শোভা সেন ছিলেন বেশি মুখর। শ্রীমতী গান্ধি একসময় ওঁর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, তাও তো কিছু পাচ্ছেন, আমরা অন্তত যতটুকু দিতে পারছি। যান না একবার রাশিয়ায়, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে দেখুন দিকি কী হয়! এখানে তো আমাদের কাছে টাকা নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধেই কথা বলতে পারছেন। বেচারি শোভাদি সেদিন বাকি সময়টা ম্লান মুখে করে একেবারে চুপ মেরে ছিলেন। তৃপ্তি মিত্রের অন্তিম সৎকারের ব্যয়ভার রাজ্যসরকার বহন করেছিল বলে ওঁর স্মরণসভায় শোভাদি বলেছিলেন, আহারে, এই সরকারের আমলে মরেও সুখ! তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু অবশ্য সেটা শুনে মাথা নিচু করে বসেছিলেন, হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে না পেয়ে বোধহয়।

আর একটি ব্যাপারও লক্ষ করার মতো। ১৪ মার্চের পর দীর্ঘ সময়কাল প্রতিবাদী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সরকার বা শাসকদলের নীতি বা কাজকর্মের সমালোচনা করে এসেছেন। ওদের পক্ষের সমর্থক শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কোনও কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছেন তাঁরা। কিন্তু আমাদের ওই পক্ষের বন্ধুদের একটি বড় অংশ সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের নীতি বা কর্মসূচির প্রতি যত না সমর্থন জানিয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি গাল পেড়েছেন আমাদের। এখানেও পার্টি-কর্তাদের বোঝানোর চেষ্টা যে, 'আমরা তোমাদেরই লোক। সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিরুদ্ধমতের মোকাবিলা করার দায়িত্ব আমরাই নিলাম'। অর্থাৎ, এঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক হার্মাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এর পূর্বে এমনটা কোন কালে কোন দেশে ঘটেছিল ইতিহাস সচেতন মানুষরা ঠিকই জানেন। ব্রেখট সাহেব তো সেই রাজত্বের 'আতঙ্ক ও দুর্দশা' নিয়ে এক অসাধারণ নাটগুচ্ছ রচনা করে গেছেন, যা একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে শিল্পীদের কাছে। যাঁরা বলছেন, 'তোমাদের তো সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই আজ বিরুদ্ধে কথা বলছ তোমরা', তাঁরা কিন্তু তাঁদের মতো করে সত্য কথাটাই বলছেন। তাঁরা বলতে চাইছেন, 'আমাদের এখনও পাওয়ার বাকি আছে, তাই আমরা এখনও এদের সঙ্গে আছি। যেদিন পাওয়া হয়ে যাবে, সেদিন তোমাদের মতো আমরাও সত্যি কথা বলতে দ্বিধা করব না। এখন বিরোধিতা মানেই অনেক কিছু খোয়ানো।' অত্যন্ত বাস্তববাদী দর্শন ও যুক্তি! আমি কিন্তু আমার বন্ধুদের সবাইকে অতটা চতুর স্বার্থান্বেষী ভাবতে রাজি নই। আমার মনে হয়, এখানে ভয় বা আতঙ্কও একটা বড় কারণ। একজন পেশাদার শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক, কিংবা শিক্ষক অধ্যাপকের চাকুরিপ্রার্থী মানুষ তো দীর্ঘকাল যাবৎ দেখে আসছেন যে ওরা ভালো করতে না পারলেও ক্ষতি করে দিতে পারে যখন তখন। তাই কী দরকার ওদের চটিয়ে দিয়ে? চুপচাপ থাকাটাই শ্রেয়, বরঞ্চ পারো তো এমন ভাব দেখাও যে তুমি ওদের সঙ্গেই আছ। এটা নিতান্তই সারভাইভাল ইনস্টিংটের প্রশ্ন। আবার ভয়টা যে শুধু ওপক্ষে আছে তাই নয়। প্রতিবাদী পক্ষেও দেখেছি অনেকে 'অরাজনৈতিক' ঘোমটায় মুখ ঢেকে গা বাঁচিয়ে চলছেন। কে কখন কোথায় কার সঙ্গে দেখে ফেলে, তাহলেই সমূহ বিপদ। এদের অনেককে তাঁদের বক্তৃতা বা লেখার শেষে নিয়ম করে যোগ করতে দেখেছি: 'তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি তৃণমূল হয়ে গেছি।' কোন ভয় বা আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে এরকম কবুলিয়তি, বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসলে জাত বা তকমা খোয়াবার ভয় কাজ করছে এদের মধ্যে। তাই এই অতি সাবধানী শুচিবায়ুগ্রস্ত আচরণ। গ্রামের বা বস্তির সাধারণ মানুষ ভয় বা আতঙ্ক দূরে সরিয়ে রেখে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের যে সাহস দেখাচ্ছেন, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা সেই সাহস কবে দেখাবেন, তারই অপেক্ষায় রইলাম।